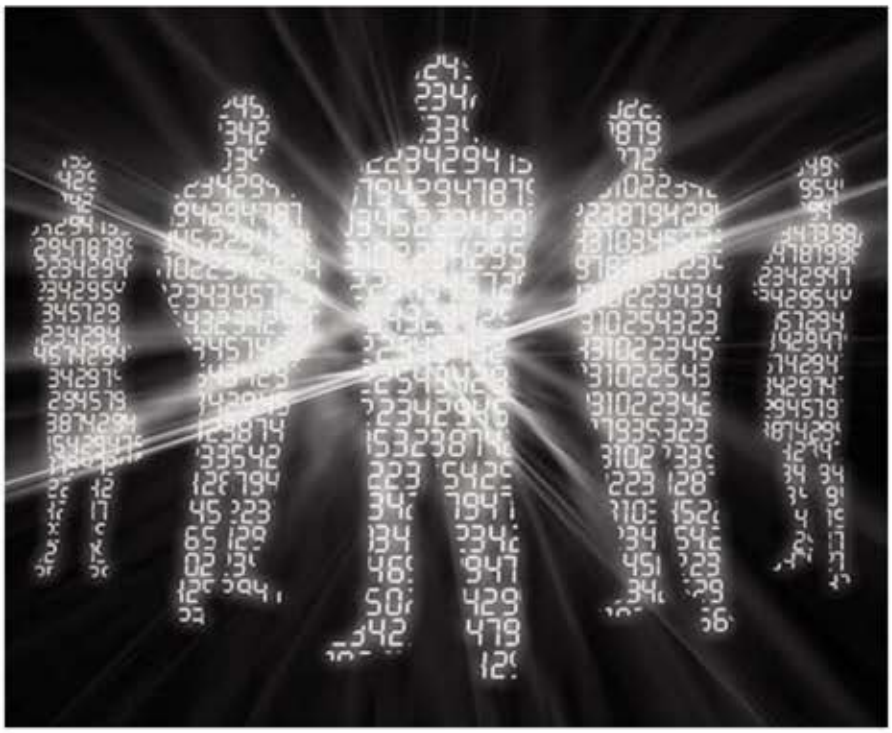

ডিজিটাল মুক্তিযুদ্ধের কৌশল

মোস্তাফা জব্বার

২০০৮ সালে যেটি ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০১৩ সালে সেটি পরিণত হয়েছে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লড়াইয়ে। শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেই এই রূপান্তরটি হয়েছে। স্মরণ করে দেখুন, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছিল। ২০১৩ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সেই দলটিই ২০৪১ সালে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল মধ্যম আয়ের একটি দেশ গড়ে তোলা। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার সময়টিতে আওয়ামী লীগ একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে চায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এই দলটির ভাবনাটিকে কেউ যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারেন তবে ভুল হবে। প্রসঙ্গত, এই কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে– দেশের আর কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী এর আগে বা পরে এমন কোনো লক্ষ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করেনি। ফলে আমরা যারা পাকিস্তান ভেঙ্গে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলাম তাদের কাছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই দেখতে হবে।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে যেমন ছিল মুক্তিযুদ্ধ, তেমনি কৃষি-শিল্প ও কায়িক শ্রমভিত্তিক সভ্যতাকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করাটাও তেমনি একটি মুক্তির লড়াই। এই মুক্তির লড়াই শুধু আমাদের নয়, বিশ্ববাসীর। তবে বর্তমানের প্রেক্ষিতে জাতিগতভাবে বা রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে থেকেই এই মুক্তির লড়াইটা সবাইকে করতে হচ্ছে। আমাদের নিজেদের পশ্চাৎপদতা অন্যদের চেয়ে অনেক ভিন্নতা দিয়েছে। বিশেষ করে আমরা সেইসব দেশের কাতারে দাঁড়াতে পারছি না, যেসব দেশ এরই মাঝে কৃষিযুগকে অতিক্রম করে শিল্পযুগে পা ফেলতে পেরেছে। মাত্র অর্ধশতক আগে স্বাধীনতা পাওয়া ও শিল্পবিপ্লবের মহাসরণিতে যোগ দিতে না পারা বাঙালী জাতি বা বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি এক ডিজিটাল মুক্তির লড়াই। যারা একাত্তরের জাতীয় স্বাধীনতায় শরিক হতে পারেননি তাদের জন্য এটি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আরেকটি সুযোগ। কামনা করি আমাদের সন্তানেরা সেই লড়াইয়ে ডিজিটাল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেবে।

আমার জন্য শুধু মনে করানো দরকার, ২০০৭ সাল থেকেই আমি এসব কৌশলের কথা বলে আসছি। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কৌশলপত্র প্রস্তুত করেছে। তবে সাধারণ মানুষ সেগুলো পর্যালোচনা করার সুযোগ পায়নি। এতে কি আছে সেটিও আমাদের জানা নেই। ইদানিং সেই কৌশলপত্র নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। এরই মাঝে ২০১৩ সালের দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এখনও সরকার কোনোভাবেই এমন একটি মহৎ কাজের কোনো রূপরেখাই প্রকাশ করেনি। এরই মাঝে ২০০৯ সালের আইসিটি নীতিমালা আপডেট হয়েছে। তবে এটি ধারণা করাই উচিত নয় যে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার ঘোষণার দুই বছর পর ২০১৫ সালের নীতিমালায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কোনো রূপকল্প থাকতে পারে। আমি কোনোভাবেই মনে করি না, ২০৪১ সালে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের কোনো উদ্যোগ এখনই নেয়া হচ্ছে। তবে সুবিধাটি হচ্ছে যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তিটা তৈরি হয়ে যাবে। সরকার সম্ভবত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলাকে আপাতত প্রাধান্য দিচ্ছে। হয়তো এরপর জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা ভাবা হবে। একটি সুখবর আমরা নিজেদের জন্য অনুভব করতে পারি যে, পরিকল্পনা কমিশন তাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিষয়গুলো মাথায় রেখেছে বলে শুনছি।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার প্রথম সোপান ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের প্রধান কৌশল হলো তিনটি। এই কৌশলগুলো মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর এবং একটি ডিজিটাল জীবনধারা গড়ে তোলা ও বাংলাদেশকে জন্মের প্রতিজ্ঞায় গড়ে তোলা বিষয়ক।

কৌশল ১ : ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ : বাংলাদেশের মতো একটি অতি জনবহুল দেশের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম কৌশল হতে হবে এর মানবসম্পদকে সবার আগে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বা অন্তত ডিজিটাল যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এর ডিজিটাল রূপান্তর করা। এ দেশের মানবসম্পদের চরিত্র হচ্ছে, জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগই তিরিশের নিচের বয়সী। ২০১৫ সালের শুরুতে শুধু শিক্ষার্থীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ৪ কোটি। ঘটনাচক্রে ওরা এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে শিল্পযুগের দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত। অন্যদের সিংহভাগ প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম। অন্যদিকে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী, যাদের বড় অংশটি ঘর-কন্না ও কৃষিকাজে যুক্ত থাকলেও একটি স্বল্পশিক্ষিত নারী সমাজ পোশাক শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে লিপ্ত হয়ে গেছে। এই খাতটিতে এই ধরনের আরও অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকায় এদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। এজন্য এই খাতে যথাযথ প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী সমাজের জন্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত নয়। এদেরকে ডিজিটাল যুগের শিক্ষা দিতে হবে। সুখের বিষয়, ডিজিটাল যুগে নারীদের কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে যে, তাদেরকে আর পশ্চাৎপদ বলে গণ্য ▸

করার মতো অবস্থা বিরাজ করছে না।

মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রধান ধারাটি তাই নতুন রূপে গড়ে উঠতে হবে। এদেরকে দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষিশ্রমিক বা শিল্পশ্রমিক গড়ে তোলার কারখানা থেকে জ্ঞানকর্মী তৈরি করার কারখানায় পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের নিজের দেশে বা বাইরের দুনিয়াতে কায়িকশ্রমিক, কৃষিশ্রমিক ও শিল্পশ্রমিক হিসেবে যাদেরকে কাজে লাগানো যাবে তার বাইরের পুরো জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে। বস্তুত প্রচলিত ধারার শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বাড়তি কোনো প্রয়োজনীয়তা হয়তো আমাদের থাকবে না। কারণ যে তিরিশোর্ধ জনগোষ্ঠী রয়েছে বা

যারা ইতোমধ্যেই প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে, তাদের প্রচলিত কাজ করার দক্ষতা রয়েছে এবং তারাই এই খাতের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরের সময় পর্যন্ত বর্তমানের শিক্ষাধারায় যে জনগোষ্ঠী তৈরি হতে থাকবে, তারাও কায়িক শ্রমভিত্তিক জনসম্পদই হবে। ফলে নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায় জ্ঞানকর্মী বানানোর কাজটাই আমাদেরকে সবার আগে করতে হবে। এর হিসাবটি একেবারেই সহজ। বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এটি বস্তুত একটি বিপ্লবী রূপান্তর। প্রচলিত দালানকোঠা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চি বহাল রাখলেও এর শিক্ষকের যোগ্যতা, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে হবে।

আমি ছয়টি ধারায় এই রূপান্তরের মোদ্দা কথাটা বলতে চাই। এসব কৌশল এই মুহূর্তের ভাবনাকে ও বিদ্যমান প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে প্রস্তাব করা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব কৌশলেরও আমূল পরিবর্তন করতে হবে। কয়েকটি প্রধান কৌশলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক. এটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আমাদেরকে ডিজিটাল যুগের জন্য মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য জ্ঞানকর্মী তৈরির কথাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। এজন্য সবার আগে আমাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থাতেই পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষার বড় পরিবর্তনের প্রথমটি হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে পারে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে স্বচ্ছন্দ এমন প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং ধারাবাহিকভাবে এমন ব্যবস্থা করা যাতে ভবিষ্যতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তেমন শিক্ষাই নতুন প্রজন্ম ধারাবাহিকভাবে পাবে।

এজন্য অবিলম্বে আইসিটি বিষয়টি শিশুশ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নাম্বার হলেও মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে কমপক্ষে ১০০। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এর মান অন্তত ২০০ নাম্বার হতে হবে। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি মাধ্যম নির্বিশেষে সবার জন্য এটি এমনভাবেই অবশ্য পাঠ্য হতে হবে। পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বিষয়টিকে কোনো ধরনের অপশনাল নয়, বাধ্যতামূলক করতে হবে। এজন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ. প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কমপিউটার হিসেবে কমপিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এই কমপিউটারগুলো শিক্ষার্থীদেরকে হাতে কলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মাঝে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে। দেশজুড়ে বিনামূল্যের ওয়াইফাই জোন গড়ে তুললে শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করবে। ইন্টারনেটকে শিক্ষার সম্প্রসারণের বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

গ. প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা-কলম-বইকে কমপিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্টফোন, বড়পর্দার মনিটর/টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। প্রচলিত স্কুলের অবকাঠামোকে ডিজিটাল ক্লাসরুমের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থাতে রূপান্তরের আরও তিনটি কৌশলের কথা আমরা আলোচনা করতে পারি। এরপর আরও দুটি প্রধান কৌশল নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ঘ. সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেইসব কনটেন্টকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। অনুগ্রহ করে কেউ এসব কনটেন্টকে পাওয়ার পয়েন্টের উপস্থাপনা বা ভিডিও লেকচার বলে মনে করবেন না– এগুলো যেন হয় ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার। ইতোমধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির নামে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, সেসব কর্মকাণ্ডের ফলাফল মূল্যায়ন করে বিশ্বমানের ইন্টারেকটিভ ডিজিটাল কনটেন্ট পেশাদারিভাবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তৈরি করতে হবে। এনজিওদের ডেকে এনে কনটেন্ট তৈরি করার কাজ বিলিয়ে দেয়ার প্রবণতা ছাড়তে হবে। একই সাথে বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ কনটেন্ট তৈরি করার জন্য ব্যাপক সহায়তা দিতে হবে। আইসিটি ডিভিশন, এটুআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে এ ধরনের কনটেন্ট তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যমান পাঠক্রম হুবহু অনুসরণ করা যাবে না এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমে কাগজের বই বা বইয়ের পিডিএফ কপি দিয়ে শিক্ষাদান করা যাবে না। ক্লাসরুমে প্রজেক্টর আর ল্যাপটপ দেয়ার কাজটির সাথে কনটেন্ট যুক্ত না করা হলে উপযুক্ত ফলাফল পাওয়া যাবে না– নীতি-নির্ধারকদের তা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয়, তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এসব কনটেন্টকে অবশ্যই মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারেকটিভ হতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল যুগের বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী বিষয়বস্তু শিক্ষা দেয়া। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত এমনসব বিষয়ে পাঠদান করা হয়, যা কৃষি বা শিল্পযুগের উপযোগী। ডিজিটাল যুগের বিষয়গুলো আমাদের দেশে পড়ানোই হয় না। সেসব বিষয় বাছাই করে তার জন্য পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। আমার ধারণা, বিদ্যমান বিষয়গুলোর শতকরা ৯০টি ভবিষ্যতে না পড়ালেই সঠিক কাজটি করা হবে। একই সাথে শিক্ষার মাধ্যম-ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষার বহুবিধ ধারাকে সমন্বিত করতে হবে।

ঙ. সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব আয়োজন বিফলে যাবে যদি শিক্ষকেরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ▸

কৌশল ২ : ডিজিটাল সরকার : রাষ্ট্র ও সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরের আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সরকার নামের প্রতিষ্ঠানটি অতি প্রাচীন। এর পরিচালনা পদ্ধতিও মান্ধাতার আমলের। আমরা এখন আধুনিক রাষ্ট্র নামের যে রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলি এবং জনগণের সেবক সরকার হিসেবে যে সরকারকে চিহ্নিত করি, তার ব্যবস্থাপনা বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক। এক সময়ে রাজরাজড়ারা সরকার চালাতেন। তবে সেই ব্যবস্থাকে স্থূলাভিষিক্ত করেছে ব্রিটিশদের সরকার ব্যবস্থা। সেটি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে আসছি। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার এতদিন পরও সেই ব্যবস্থা প্রবল দাপটের সাথে রাজত্ব করছে। কথা ছিল সরকারটি অন্তত শিল্পযুগের উপযোগী হবে এবং তার দক্ষতাও সেই পর্যায়ের হবে। কিন্তু কৃষিযুগে থেকেই শিল্পযুগের সরকার চালাতে শুরু করার ফলে মানসিকতাসহ সব পর্যায়েই আমাদের সঙ্কট চরম পর্যায়ের। একদিকে সামন্ত মানসিকতা ও অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিকতা সরকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। '৪৭ সালে একবার ও '৭১ সালে আরেকবার পতাকা বদলের পরও আমলাতন্ত্র বদলায়নি। একটি স্বাধীন জাতির জন্য যে ধরনের প্রশাসন গড়ে ওঠা দরকার, সেটিও গড়ে ওঠেনি। কাজ করার পদ্ধতি রয়ে গেছে আগের মতো। এজন্য যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন তাকে বিবেচনায় নিয়ে সামনে পা ফেলতে হবে। নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলো এই কাজে সহায়ক হবে। কৌশলগুলো হতে পারে এরকম।

ক. প্রথমত, সরকারি অফিসে কাগজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করতে হবে। সরকারের সব অফিস, দফতর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কাগজকে ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে স্থূলাভিষিক্ত করতে হবে। এজন্য সরকার যেসব সেবা জনগণকে দেয়, তার সবই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে হবে। সরকারি দফতরের বিদ্যমান ফাইলকে ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করতে হবে। নতুন ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। এসব ডকুমেন্টের ডিজিটাল ব্যবহার এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটাল করতে হবে। সরকারের মন্ত্রীবর্গসহ এর রাজনৈতিক অংশকেও এজন্য দক্ষ হতে হবে। সংসদকে ডিজিটাল হতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকেও হতে হবে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ। বিচার বিভাগকে কোনোভাবেই প্রচলিত রূপে রাখা যাবে না। মামলা-মোকদ্দমার বিবরণসহ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হতে হবে। বিচারক ও আইনজীবীদেরকে ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।

সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভূমি ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। সামরিক বাহিনীকে ডিজিটাল যুদ্ধে দক্ষ হতে হবে।

খ. দ্বিতীয়ত, সরকারের সব কর্মচারি-কর্মকর্তাকে ডিজিটাল যন্ত্র দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে জানতে হবে। এজন্য সব কর্মচারী-কর্মকর্তাকে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নিয়োগের সময় একটি বাধ্যতামূলক শর্ত থাকতে হবে যে– সরকার যেমন ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে, সরকারে নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে সেই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারতে হবে। হতে পারে যে, প্রচলিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ থেকে এই যোগ্যতা কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে না। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের শর্ত হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির সাধারণ জ্ঞানকে একটি শর্ত হিসেবে রেখে এদের সবার জন্য নতুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

গ. তৃতীয়ত, সব সরকারি অফিসকে বাধ্যতামূলকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে এবং সব কর্মকাণ্ড অনলাইনে প্রকাশিত হতে হবে। সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও সার্বক্ষণিকভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকতে হবে। সরকার যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছে তার সাথে ডাটা সেন্টার স্থাপন, ডাটা সেন্টারের ব্যাকআপ তৈরি বা আরও প্রাসঙ্গিক কাজগুলো করতে হবে।

ঘ. চতুর্থত, সরকারের সব সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য জনগণের দোরগোড়ায় সেবাকেন্দ্র থাকতে হবে। যদিও এরই মাঝে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তথাপি সিটি কর্পোরেশন ও তার প্রতি ওয়ার্ডে, পৌরসভা ও তার প্রতি ওয়ার্ডে এবং মার্কেটপ্লেসগুলোতেও ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দেশজুড়ে থাকতে হবে বিনামূল্যের ওয়াইফাই জোন। জনগণকে সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারের সব সুযোগ দিতে হবে। থ্রিজির প্রচলন এই বিষয়টিকে সহায়তা করলেও এর ট্যারিফ এবং সহজলভ্যতার চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে।

ঙ. পঞ্চমত, দেশের বিদ্যমান সব আইনকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করতে হবে এবং সেই অনুপাতে আইন ও বিচার বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রকে মেধাসম্পদ রক্ষা ও ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সব ধরনের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

চ. ষষ্ঠত, সরকারের সাথে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল করতে হবে। অর্থনীতি, শিল্পকারখানা, মেধাসম্পদ, আইন-বিচার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনীকে ডিজিটাল করতে হবে।

মাত্র ছয়টি পয়েন্টে যত ছোট করে আমি কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, তাতে মনে হতে পারে খুব সহজেই বোধহয় সব হয়ে যাবে। সরকার যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সামনের পাঁচ বছরে একটি ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে হিমশিম খাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে সরকার তার নিজের প্রশাসনকে ডিজিটাল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়নি। সরকারের জনবলের মাঝে প্রযুক্তি ব্যবহারের অদক্ষতা ছাড়াও আছে দুর্নীতির প্রকোপ। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হলে সরকারের দুর্নীতিবাজ আমলারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে দেয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভূমি, বিচার, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দুর্নীতির কোটারি আছে। এই খাতগুলোতে যদি কঠোরভাবে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রয়াস নেয়া না হয়, তবে ডিজিটাল সরকারের ধারণাই ভেস্তে যাবে।

ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবহার করতে না পারেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে না জানেন। তারা নিজেরা যাতে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন, সে প্রশিক্ষণ তাদেরকে দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকেরা কোনো অবস্থাতেই পেশাদারি কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন না। ফলে পেশাদারি কনটেন্ট তৈরির একটি চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল শিক্ষার গবেষণা ও প্রয়োগে নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্রমান্বয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে হবে।

চ. বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত তিরিশের নিচের সব মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বজুড়ে যে কাজের বাজার আছে, সেই বাজার অনুপাতে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের যেসব মানবসম্পদ বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে, তাকে কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে হবে। দেশের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য সরকার স্থাপিত ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলোকেও ব্যবহার হতে পারে। আমি বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের এলআইসিটি প্রকল্প, বেসিসের প্রশিক্ষণ প্রকল্প, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও অন্যান্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রকল্পগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি। এখনও প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ধারা বাস্তবমুখী ও সঠিক নয়।

কৌশল ৩ : ডিজিটাল জীবনধারা : ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে ডিজিটাল জীবনধারা গড়ে তোলা। দেশের সব নাগরিককে ডিজিটাল যন্ত্র-প্রযুক্তি দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে তার জীবনধারাটি ডিজিটাল হয়ে যায়।

আমি এই কৌশলের জন্যও ছয়টি কর্ম-পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছি।

ক. দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কমপক্ষে ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সুলভ হতে হবে। দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে এই গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি অফিস-আদালত, শহরের প্রধান প্রধান পাবলিক প্লেস, বড় বড় হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে ওয়াইফাই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যদিকে রেডিও-টিভিসহ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সব ব্যবস্থা ইন্টারনেটে- মোবাইলে প্রাপ্য হতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতির অফিস-আদালত-শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বলা যেতে পারে, এটি হবে ইন্টারনেট সভ্যতা।

খ. ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, আইন-আদালত, সালিশ, সরকারি সেবা, হাটবাজার, জলমহাল, ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে হবে।

গ. মেধাশিল্প ও সেবাখাতকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পনীতি তৈরি করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। সেজন্য শিল্প-ব্যবসায় বাণিজ্য-অর্থনীতি বিষয়ক নীতি ও কর্মপন্থাকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করতে হবে।

ঘ. দেশের সব আইনকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী করতে হবে। মেধা সংরক্ষণ ও এর পরিচর্যার পাশাপাশি সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ঙ. ডিজিটাল বৈষম্যসহ সমাজে বিরাজমান সব বৈষম্য দূর করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

জরুরি করণীয় : বিগত সাত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে– সরকারের এই মুহূর্তে জরুরি কিছু করণীয় রয়েছে। আমরা সবাই জানি নতুন সরকারের প্রথম করণীয় হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এরই মাঝে এই পথে সরকার যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সঙ্কট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতের মতোই এই খাতেও সহায়তা দিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কয়েকটি কাজ অতি জরুরিভাবে করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি।

০১. দেশব্যাপী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব তৈরিকে আরও বেগবান করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং সম্পন্ন করতে হবে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কাজ। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর বস্তুত থেমে আছে। এই স্থবিরতা আমাদের সামনের পথচলাকে থামিয়ে রেখেছে। ০২. ডিজিটাল সরকার প্রকল্প বস্তুত দৃশ্যমান নয়। জাতীয় ই-আর্কিটেকচার গড়ে তুলে সচিবালয়সহ সরকারের সব মন্ত্রণালয়, দফতর ও বিভাগকে ডিজিটাল করতে হবে। ওয়েবসাইট তৈরি আর নেটওয়ার্ক প্রকল্প দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে বলে আমরা শুনছি। বস্তুত এখনও জোড়াতালির পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ চলছে। একটি পরিকল্পিত পথ ধরে ডিজিটাল সরকারের কাজ করতে হবে। ভূমি ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা ও সচিবালয় ডিজিটাল করার মতো কাজগুলোতে সরকারের ঢিলেমি দৃষ্টিকটু পর্যায়ে রয়েছে– সেগুলোকে সচল করতে হবে। এটি বোঝা দরকার, ডিজিটাল সরকার ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে না। এটি আমাদের জন্য মেনে নেয়া কঠিন যে, সাত বছরেও একটি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল মন্ত্রণালয় হতে পারেনি। ০৩. মহাখালী, কালিয়াকৈরসহ দেশের অন্যান্য স্থানে যেসব হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে সেগুলোকে বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ আরও জোরদার করতে হবে। একই সাথে এসব হাইটেক পার্কের ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। ০৪. দেশের সব বাড়িতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছাতে হবে এবং ইন্টারনেটের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মাঝে আনতে হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। ধীরে ধীরে দেশের সবাইকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ০৫. মেধাসম্পদ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওয়ানস্টপ আইপি অফিস স্থাপন করাসহ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী করতে হবে। শিল্পনীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং বাণিজ্যসহ সব খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার পথে পা বাড়াতে হবে। শিল্পনীতিতে পরিবর্তন এনে জ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপনের বিধি-বিধান যুক্ত করতে হবে। এখনই খুব স্পষ্ট করে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে।

সার্বিকভাবে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার যে, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাটি বস্তুত সভ্যতার বিবর্তন ও যুগ পরিবর্তন। এটি খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে তেমন একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রধান সিঁড়ি। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সাথে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে। এখন থেকেই সেসব বিষয় নিয়েও আমাদেরকে ভাবতে হবে।

মাইলফলক সফলতা : ২০১৬ সালের সূচনালগ্নে আমরা যখন ডিজিটাল মুক্তিযুদ্ধের কৌশল নিয়ে কথা বলছি, তখন আমাদের কিছু কিছু সফলতার কথাও উল্লেখ করা দরকার। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, '৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়া ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে একাত্তর সালে স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশের অগ্রসরমানতা অনেক বেশি উজ্জ্বল। আমরা যে ডিজিটাল রূপান্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছি এটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও মালদ্বীপ সরকারও স্বীকার করেছে। আমাদের মোবাইলের ব্যবহার, ইন্টারনেটের প্রসার বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অব্যাহত জয়যাত্রা সারা দুনিয়ার কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিরাজ করে।

আমরা শিক্ষার রূপান্তরেও একটি অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছি ২০১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আরবান একাডেমিতে প্রথম শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রীর হাতে ট্যাব দেয়া হয়েছে। বিজয় ডিজিটালের প্রধান নির্বাহী জেসমিন জুঁইয়ের নেতৃত্বে একটি তরুণ ডিজিটাল মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী বিশ্বমানের ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি করে মিনি ল্যাপটপ বা ট্যাবে ইনস্টল করে দিয়েছে। আরবান একাডেমির তরুণ অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান ও বিজয় ডিজিটালের জেসমিন জুঁইয়ের মতো ডিজিটাল মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের স্বপ্নকে যে বাস্তবে রূপায়িত করবে, সে বিষয়ে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। ওদের শুভ কামনা করি

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com